ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত দরিদ্র নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে ফিল্ড ওয়ার্কের অভিজ্ঞতা

ফারজানা ইসলাম *

ভূমিকাঃ

আমি ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরের লালবাগ থানাধীন একটি বস্তিতে ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু করেছিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী তা '৯২ এর জানুয়ারীতে শেষ হবার কথা ছিল। দূর্ভাগ্য বশতঃ জন্ডিসের মত বড় অসুখে এবং গল-স্টোন অপারেশনের মত ব্যক্তিগত কারণে এবং গত ৯ই মার্চ (৯২) আমার পুরো গবেষণা এলাকাটি আগুনে জ্বলে যাওয়ায় আমার কাজ কয়েকমাস পিছিয়ে যায় এবং মে মাসের মাঝে এসে শেষ হয়। গবেষণার বিষয় ছিল Women, Employment And The Family : Poor Informal Sector Workers In Dhaka City. এই গবেষণার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেছিলাম শহরের মজুরী শ্রমে নিয়োজিত হওয়ায় নারী শ্রমিকদের পরিবারে তথা নিজ জীবনে কোন পরিবর্তন হয় কিনা?

ধরেই নেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রতিটি মেয়েই হয় কন্যা-বধূ-মাতা হিসাবে, পুরুষ প্রধানের ছায়াতলে পরিবারে গৃহী জীবন যাপন করবে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ লক্ষ গৃহী মহিলারা ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে স্থানান্তর করে ঢাকায় এসেছে কাজ বা রোজগারের জন্য। ফলে নারীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত হয়েছে পরিবারের ও সেই সাথে শ্রম বাজারেও। শ্রমিক হিসাবে তার এই প্রতিষ্ঠা মাত্রই প্রমাণ করেনা পরিবারে বা বৃত্তের সমাজে তার অখন্ডন অবস্থার থেকে মুক্তি ঘটেছে। বরং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে গবেষণা থেকে

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রমাণিত হয়েছে নারীর জন্য ''পরিবার ও নিয়োগ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়" বরং ''এটা এক ধারাবাহিকতা –একটা অপরটাকে প্রভাবিত করছে"[১]। যেহেতু বাংলাদেশের দরিদ্র নারীরা ক্রমশই অধিক সংখ্যায় ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরের শ্রম বাজারের সাথে জড়িত হচ্ছে, তাই অন্যান্য দেশের মত আমাদের সমাজেও জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবারের ওঠানামার সাথে সাথে মেয়েরা কে কেন কাজে আসছে, কাজে থাকছে বদলাচ্ছে বা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই বিষয়টি নির্বাচন করি। ইনফরমাল সেক্টরের নারী শ্রমিক এখনও প্রধান ধারা বলে আমি বিশেষত একে বেছে নেই।

পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ঃ

আমি মূলত অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিঃ (ক) কেন নারীরা শ্রমিক হয়? (খ) তাদের ঘর সংসারের দায়, পুনরুৎপাদনশ্রম বা গৃহজীবনের মতাদর্শ কতটা প্রভাবিত করে তাদের মজুরী শ্রম এর জীবন? (গ) ঢাকার দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা কাজে নামায় তাদের পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন হয় কিনা?

উল্লেখিত বিষয়গুলো দীর্ঘ ১২ মাসের ফিল্ড ওয়ার্কের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ও সাক্ষাৎকারে জানবো বলেই, এইসব মহিলাদেরকে আমি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত বস্তি থেকে বেছে নেই। একটি বস্তি থেকে ৩০টি পরিবার/ঘর (Family/house hold)-এর বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মহিলাদের নির্বাচন করি। সেই সাথে নতুন ধারার শ্রমিক –যারা নির্মাণ কাজে জড়িত তাদের এবং বাজারে/পথে দোকান বা কারবার করে এরকম আরও ১০ জনকে অন্তর্ভূক্ত করি ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে।

সাসেক্সে যখন এই প্রপোজাল লিখি তখন ভেবেছিলাম বস্তির শহর ঢাকায় অতি সহজেই বিচিত্র কাজ এর শ্রমিক অধ্যুষিত একটা বস্তি নির্বাচন করতে আমার বেশী জোর ১ সপ্তাহ সময় লাগবে। অথচ প্রায় একমাস ঘুরে ২১টা বস্তিতে (শহরের এ মাথা ও মাথা) দ্রুত জরীপ চালিয়ে জানলাম, ''একই বস্তিতে সাধারণত একই ধরনের কাজ করে মেয়েরা"। যেমন মধ্য ঢাকার বস্তিগুলোর মেয়েরা বেশীর ভাগই গার্মেন্টসে ও বাসাবাড়ী–মেসে কাজ করে। মীরপুরে হাতের কাজ, গার্মেন্টসের কাজ করে। বাড্ডায় মোড়া, পাটি বানানো; শ্যামলীতে গরু পালা, তরিতরকারী করাই বেশী লক্ষ্য করা গেছে। এই বস্তিটাই প্রথম পেলাম, যেখানে প্রায় ২৮টি বিচিত্র পেশায় মেয়েরা নিয়োজিত। কাজ করে ঘরে বসে, বাইরে গিয়ে, বাসায়, বাজারে, আড়তে বা কারখানায়, হাসপাতালে, গার্মেন্টসে।

বস্তিটি প্রায় ৪০ বৎসরের পুরাতন ও জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। তাই সহসা ওঠার ভয় নেই, অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে থাকছে সে কারণেও এটা পছন্দ করি। তাছাড়া ১৯৮৮–এর বন্যা ছাড়া প্লাবিত হয়নি বলে প্রাকৃতিক কারণে কাজ বাঁধাগ্রস্ত হবেনা আশা করে এটাকে যথাযথ স্থান মনে করি। সর্বোপরি কোন এন· জি ও· কর্মরত না থাকায় ইনফরমাল কাজে প্রতিষ্ঠিত হতে স্বউদ্যোগ লক্ষ্য করা যাবে বলে একে সঠিক স্থান বলা যেতে পারে।

বস্তি নির্বাচনের পর স্থানীয় একজন পুরুষ মানুষের (মাতবর শ্রেণীর) সহায়তায় কয়েকজন শ্রমিক মহিলার সাথে পরিচিত হই। তাদের দু'জনকে সাথে নিয়ে পুরো বস্তিটা ৬/৭ দিন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে কাজের ধরন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তারপর এদের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত মহিলাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে কাজ করবার অনুমতি চাই। যারা রাজী হন তারা আবার অন্য ধরনের পেশার পরিচিত বা স্বল্প পরিচিত মহিলাদের সাথে আমাকে আলাপ করিয়ে দেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আমি ৩০টা ঘরের মহিলাদের নির্বাচিত করি। যাদের কে শুধুমাত্র (ক) কাজের বিভিন্নতা (খ) জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তথ্য সংগ্রহ করতে করতে দেখি এতে স্থানীয়/অভিপ্রয়ানকারী (নানা জেলা থেকে আগত) মহিলা বিবাহিত, পরিত্যাক্ত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, সব ধরনের মহিলাই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ঘরে–বাইরে কাজ করে, পেশার, এই বিচিত্রিতাও এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা বস্তির অন্যান্য মেয়েরা যে ধরনের কাজ করে প্রায় সবই এতে এসেছে।

বস্তির প্রাকৃতিক, আর্থ–সামাজিক বর্ণনা ঃ

ঢাকা শহরের অন্যান্য বস্তিগুলোর মতই এটাও অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর এক পরিবেশ। সেখানে মাত্র প্রায় ২ একর জমিতে ৩০০০ এর মত লোকজন বাস করে। এলাকাটি শহরের বাণিজ্য প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। আশপাশে বিভিন্ন পণ্যের আড়ত, কারখানা, বুড়িগঙ্গার কাছে বলে পাইকারী মাছ–তরিতরকারী কেন্দ্রও এটা। নীচু জমি ভরাট করে এই পুরো বসতিটি গড়ে উঠেছে, এর দক্ষিণে খাল (নোংরা আবর্জনা ও দুষিত পানিযুক্ত) যার লাগোয়াই আরেকটি বস্তি। উত্তরেও খাল ডোবা এবং অন্য আরেকটি বস্তি। পূর্ব দিকে বড় রাস্তার সাথে যোগাযোগ রাখতে কাঁচা রাস্তা, বর্ষায় বাঁশের সাকোঁ দেওয়া হয়। এতে প্রতিবার পারাপারে ·৫০ টাকা (পঞ্চাশ পয়সা) লাগে।

বড় রাস্তার পাশে সরকারী বাস্তুহারা ৬ তলা কলোনী, সেখানে মূলত ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা থাকে। পশ্চিম দিকে কাঁচা বাজার, অন্য আরেক

বস্তির অংশ বিশেষ। পূর্ব পার্শ্বের নীচু জমিটায় শুকনার দিনে নারী–পুরুষ–শিশুরাও ''ফেরী" নিয়ে বসে। বাচ্চারা খেলে, স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস বা বিজয় দিবসে কিংবা বিয়ে–শাদীতে আনন্দ অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিম দিক থেকে বাজারের দিক থেকেও বস্তিতে প্রবেশ করা যায়, তবে কলতলা ও বাজার এলাকা বলে নোংরা। বস্তির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাজার আছে। ৫টা মুদি দোকান, ২টা চায়ের দোকান, তরকারীর দোকান। এখানকার সবচেয়ে ভাল মুদি– দোকানটা (একটা পুরাতন ফ্রিজও আছে) সহ তিনটাই মেয়েদের দ্বারা চালিত। বড় দোকানী ও আরেক দোকানী মা–মেয়ে, তরকারী বিক্রেতা হলো খালা।

মহল্লার/বস্তির বেশীর ভাগ বাড়ীই বেড়ার উপরে টিনের ছাদ, মাটির মেঝে, কিছু বাড়ীতে কাঠের দোতালা আছে এবং ১০টার মত বাড়ী পাকা। এইসব বাড়ীর ভিতরে চাপ–কল ও কাঁচা পায়খানা আছে। এরা ২৫/৫০টাকা ভাড়া বেশী নেয়। তাছাড়া বাদবাকী ৩৫০/৪০০ঘরের জন্য ২টা সরকারী চাপ–কল ও দুইটা "সরকারী" (নিজেদেরই করা, এজমালী ব্যবহারের জন্য) কাঁচা পায়খানা আছে। কাপড়–কাঁচা, গোসল অনেকেই নদীতেই সেরে ফেলে। খাবার পানির জন্য দীর্ঘ লাইন দিতে হয়। ঝগড়া ও আড্ডা কলতলার নিত্য–দিনের ঘটনা। বাড়ীর চাহিদা বেশী বলে ৬/৮ হাত প্রশস্থ ঘর, গ্যাস ছাড়াই ৩০০/৩২৫ টাকা ভাড়ায় দেওয়া হয়। ইলেকট্রিক লাইন ব্যবহার করলে আরও ২৫/৩০ টাকা দিতে হয়। বসতির জন্য না দিয়ে কারখানাকে দিলে, ভাড়া, দ্বিগুণ পাওয়া যায় বলে ভীষণ গায়ে গায়ে ঠাসা থাকবার ঘরের পাশের ঘরটিই হয় শব্দ বহুল কেমিক্যালস–এর গন্ধযুক্ত কারখানা। যেকোন সুস্থ লোকও এখানে অসুস্থ হতে পারে। এ সমস্ত নিয়ে এবং ভাড়া আদায় বা সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রায়ই ভাড়াটিয়া বনাম ''বালিটওয়ালা"দের (ভাড়াটিয়াদের পক্ষ থেকে দেওয়া বাড়ীওয়ালাদের বিকৃত নাম) মধ্যে বড় রকমের দ্বন্দ্ব হয়। শুনেছি ৮৮'এর বন্যায় বাড়ীওয়ালারা, রিলিফ থেকে ভাড়াটিয়াদের বঞ্চিত করেছে, এবার আগুন লাগবার ঘটনার পর দেখেছি, রিলিফ এর পুরোটাই অনেক বাড়ীওয়ালা/বাড়ীউলি নিতে চেয়েছে। যা নিয়ে একদিন মহিলা (ভাড়াটিয়া) ও বাড়ীওয়ালা পুরুষে প্রায় হাতাহাতি হচ্ছিল। তবে কোন কোন বাড়ীওয়ালা, ভাড়াটিয়াদের সুবিধার দিকটাও দেখে। এদের অনেকেই বাইরে থাকে। সংখ্যায় কম। তবে কোন কোন বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনও ভাড়া থাকে। তাছাড়া পাশাপাশি বড় হওয়া ছেলে মেয়েরা নিজেরা ভালবেসে বিয়েও করে, সেখানে এই প্রাচীর টেকেনা। তার উপর অনেক ভাড়াটিয়ার অবস্থাই স্ব স্ব বাড়ীওয়ালা থেকে ভালো তাই সম্মানও পায়। বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়া উভয়েই এই বস্তিকে ''মহল্লা" বলতে অভ্যস্ত। ঢাকাইয়া বা ঢাকার আদিবাসীদের ভাষায় পাড়াকে মহল্লা বলে। স্থানীয়দের মত হতে গিয়ে নানান জেলা থেকে আগত

লোকজনও এত চমৎকারভাবে ''ঢাকাইয়া" ভাষা রপ্ত করেছে, যে প্রথম ১ মাস আমি যাদেরকে অবশ্যই ''ঢাকার'' ভেবেছিলাম, তারা অধিকাংশই ছিলেন বিক্রমপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, কলাকোপা, এমনকি সুদূর রাজশাহীরও।

পুরো মহল্লাতেই/বস্তিতেই ভিন্ন ধর্মের লোক প্রায় অনুপস্থিত। তবে এক সময় বিহারীরা ছিল বলে, তাদের উত্তরসূরী এখনও কেউ কেউ আছে। অনেক পরিবারের হয় স্বামী নয় স্ত্রী উর্দূ ও বাংলা মিশিয়ে কথা বলে।

পুরো বস্তিতেই প্রচন্ডভাবে আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ করে মা-মেয়ের পরিবার, বোন-বোন পরিবার বা খালা-বোনঝি পরিবারের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়। এই বস্তির মেয়েদের অনেকেই সূতার কারখানা,গুইল, সাদাপাতা, স্পঞ্জ, প্লাষ্টিক সহ অন্যান্য কারখানায় কাজ করে। সেখানে রাতে শিফ্‌ট ডিউটি করতে হয়, ফলে দেখাশুনার জন্য নিকটজন থাকলে নিরাপদ বোধ করে। তাছাড়া আমার ৩০ ঘরের মধ্যেই ১২টি ঘর মহিলা প্রধান,যার কয়েকটিতে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষও নাই। বরং মেয়েরা বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় এসে মায়ের সাথে থাকছে। এমন পরিবার আছে, মেয়ে ছোট বাচ্চা নিয়ে ঘরে বসে মালা গাঁথে বা রাধে বা সেলাই-এর কাজ করে। মা মাঝ বয়সী, দূরে কাজ করে। এদেরই প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই বিয়ে করে দূরে থাকে, আলাদা। অথবা এই বস্তিরই অন্য ঘরে। পুরুষের পক্ষ থেকে মা-বাবার পরিবারের সাথে থাকার ঘটনা তুলনামূলক ভাবে মেয়েদের চেয়ে কম। অর্থাৎ অন্যান্য বস্তির মতই মাতৃকেন্দ্রিকতা (Matrifocality) বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২]

এখানে যারা জমি দখল করে আছে তারা ছাড়া খুব কম পরিবারেরই বাইরে কোথাও স্থাবর সম্পত্তি আছে। গ্রামে যোগাযোগ বেশ কম। বেশীরভাগই ফিরতেও চায়না।

তবে পুরো মহল্লাতেই/বস্তিতেই যেটা ভীষণ ভাবে চোখে পড়ে তাহলো পথের উপর ঘরের দুয়ারে মহিলা বা শিশুরা পুরুষদের পাশাপাশি পিঠা; প্রায় পচা সিজনাল ফল বিক্রি করে। এইসব কারবারী ছাড়াও প্রতিদিনই এখানে নতুন ও পুরাতন কাপড়, সাজগোজের সামগ্রী, বাদাম, ইত্যাদি ফেরী করতে বাইরে থেকে অথবা বস্তি থেকেই মেয়েরা ঘোরে। এই বস্তির মেয়েরা ''ফেরী" নিয়ে বাইরেও যায়। তাছাড়া প্রায় ঘরেই নানান ধরনের ''মাল" (চুড়ি, মালা, হাতের কাজ করা কাপড়, বাঁশী, প্লাষ্টিকের খেলনা) বানাতে দেখা যায় বাচ্চা থেকে বড় সব বয়সের মেয়েদের। এমনকি বাড়ীতে আরবী বাংলাও মেয়েরা এসে পড়ায়।

দু'চার-পাঁচ ঘর পরই দেখা যায় নেশাখোর, জুয়ারী, অকর্মন্য স্বামী, ভাই, বাবা বা ছেলে আছে। কিন্তু একেবারে কিছু অবস্থাপন্ন মহিলা (যাদের পুরুষরা যথেষ্ট রোজগার করে) ছাড়া আর সবাই একই সাথে একাধিক কাজও করে। এমনকি অবস্থাপন্ন মেয়েরাও গোপনে টাকা ''লাগায়" যা থেকে সুদ পায়। আমি

এমন একজন মহিলাকে জানি যার ঘরে অন্যের টি·ভি· বেনারসী শাড়ী, এ্যালমুনিয়ামের হাড়ি পাতিল বন্ধক ছিল, প্রায় ১০ হাজার টাকার জিনিষ পুড়ে ছাই হয়েছে বিগত অগ্নিকান্ডে।

মেয়েরা যেমন কাজও করে সংসারের ও বাইরের তেমনি আজকাল এর ফাঁকে ফাঁকে নিকটস্থ UCEP স্কুলেও পড়ে। ছেলেরা অনেকেই ছোট বেলা থেকে কারখানায়–ঘাটে কাজ নেয়, লেখাপড়ার ঝোঁক কম। বা প্রয়োজন কম বোধ করে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ঈদে অনুষ্ঠানে কাপড় নেয়, সেজেগুজে বেড়াতে যায়, ছবি তোলে এবং নতুন ''বই" (সিনেমা) এলেই "হলে" গিয়ে দেখে। মহিলারাও টিভি নাটক ও বই দেখেন, স্বামী বা ছেলেকে লুকিয়ে নিজের রোজগারে বই দেখে দুঃখ তাপ ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। কাজে বা বেড়াতে গেলেও বেশীর ভাগ সময়ই হাটেন। না হলে পড়শীদের সাথে খরচ শেয়ার করে রিকসায়ও যান। অথচ ছেলেমেয়ের অসুখ সম্পর্কে আমাকে যত বেশী জানাতেন তার একভাগও জানাতেন না নিজের জটিল মেয়েলী অসুখ হলেও।

গবেষক ও বস্তিবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

আমাকে এই বস্তি চিনতে সাহায্য করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের দুজন ছাত্রী, সঙ্গে ছিল আমার এক আত্মীয়া। আমরা যখন সকালে পৌঁছে ঘুরে ঘুরে কারখানাগুলো দেখছিলাম এবং বাজারের বড় মুদি দোকানীর সাথে আলাপ করছিলাম তখন অনেকেই আমাদের অনুসরণ করছিল। তবে বাজারে মাতবর গোছের প্রায় ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন পুরুষ আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। মেয়েদের কোন কাজ দিবোনা, কিন্তু তাদের কাজের জীবন ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই, ব্যক্তিগত কারনে, তা শুনে গভীর অনাগ্রহ প্রকাশ করলেন। পরে সারাদিন ঘুরে যখন চলে আসছি তখন ঐ লোকই আবার ডেকে ঘরে নিলেন, কারণ ওনার ''পরিবার'' আমাকে দেখতে চায়। ''ইনভারছিটির" প্রফেসরকে দেখতে চায়। ভদ্রলোকের বাড়ী বিক্রমপুর, স্ত্রীর বাড়ীও জিঞ্জিরা। কথা বলছিলেন ঢাকার ভাষায়। অনেক দিন কুয়েতে বাবুর্চির কাজ করেছেন, তাই রিসার্চের ব্যাপারটা বুঝলেন। সব শুনে, আমার স্বামীর বাড়ী 'বিক্রমপুর' জেনে হঠাৎ করে আগ্রহী হয়ে বললেন "আপনি পর শুক্রবার আসেন– শ্রমিক মহিলাদের সাথে আলাপ করায়া দিবো। আজ চলেন কারখানা দেখাই" নিয়ে গেলেন মুদি মহিলার কাছে, ''ভয়ের কিছু নাই, আপা তোমগো মত মেয়েগো সম্পর্কে জানতে চায়–কেমনে দোকানদার হইলা, কামে লাগলা এইসব, পারলে সময় দিও।" মুদি মহিলাও হেসে বলল– ''আইচ্ছা আইয়েন।"

চা কিনে এনে (এখানে সব বাড়ীতেই কেনা চা খায়) বিস্কিটসহ আমাদের আপ্যায়নও করেছিলেন। তারই মাধ্যমে আমি প্রথম দু'জন মহিলার সাথে পরিচিত হই। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এক থেকে অন্যজন করে করে আমার সব ''ঘর" নির্বাচন করি।

প্রথম প্রথম 'মায়া-বড়ি' আপা বলে পিছন থেকে ছেলেরা ফোড়ন কাটত। তারপর মহিলা পুরুষ সকলেই ভেবেছিল ইলেকশন সামনে, তাই কোন দল থেকে নিশ্চয়ই ভোট চাইতে এসেছি। এর পর ভেবেছে আদম শুমারীর লোক। যখন বারবার জনে জনে আমি একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি ও অন্যান্য পরিচয় অস্বীকার করি এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট ঘরগুলোয় সকাল-সন্ধ্যা কাজ করা শুরু করলাম তখন ধীরে ধীরে অকারণ খোচাঁনো কমে গেল। মায়েদের সম্পর্ক ধরে ছেলেদের কারো কাছে হলাম খালা, আপা, ফুপু। তারাই আমার সাথে পরে বস্তিতে ঘুরত, মাস দুয়েক কাজের পর মার্চ মাসে এক খালা বললেন ''মা আমি মনে করছিলাম ভদ্রলোকের মাইয়া, তুমিও এই পরিবেশে ১২ মাস আইবানা, পরিকল্পনার আপাগো মত লোক দিয়াই কাম সারবা, অখন দেখি আমাগো বাড়ীঘররে তুমি ঘরবাড়ী বানাইয়া লইছ"। প্রথম দিকে দুপুরে বাসায় এসে খেয়ে যেতাম। পরে প্রায়ই এদের সঙ্গেই খাওয়া-বিশ্রাম সব সারতাম। তবে একই ঘরে পুরুষ মানুষ উপরে চৌকিতে ঘুমিয়ে থাকলে (রাতে কাজ করে এসে) মাটিতে বসে খেতে বা জীবন কাহিনী শুনতে লজ্জা লাগত। আমার মধ্যবিত্ত সত্তার Privacy বোধ নড়ে-চড়ে উঠত। তাছাড়া ওরাও লোকজনের সামনে অনেক কিছু বলতে চাইত না-বলত "সকল কথা আপা হাটে বিকায়না"। কিন্তু দুইজন মহিলা ছাড়া আর কেউ কাজ চেয়ে বা পুঁজি চেয়ে বিব্রত করেনি।

তবে স্বামীর ড্রাগ আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য, নিজেদের মেয়েলী অসুখের চিকিৎসার জন্য কোথায় যাওয়া যায়, কাবিনের টাকা আদায় করতে কি করা যায়, এসব পরামর্শ চেয়েছে। আমি এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোয় এদেরকে সাথে নিয়ে গিয়ে ভর্তি হতে সাহায্য করেছি। যা অন্য সমাজ গবেষকদের দৃষ্টিতে ''অতিমাত্রায় বিজড়ন" মনে হতে পারে। আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত হয়ে যে তথ্য বা সুযোগ সবার জন্য খোলা বলে আমি জানি, তা এই অজ্ঞান, আর্থিকভাবে নিরুপায় মহিলাদের জানানো দরকার ছিল। তাতে মানসিক ভাবে জড়িয়ে না গিয়েও অপরাধ বোধ হালকা করা যায়। কারণ পূর্বোল্লিখিত খালার মতই আমাকে বেশীর ভাগ মহিলাই বিশ্বাস করেছিল। অথচ অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেনি মাতবর শ্রেণীর পুরুষরা। একজনতো ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়েই শুধু কাজ করতাম বলে মন্তব্য করল ''আপনের কাম কি জিন্দেগীতে শেষ হইব? আপনের পরে আদমশুমারীর বেটারা আইয়া সব ঘর

গইনা লেইখা নিল। আর আপনের ৩০ ঘর ও শেষ হয়না? ইনভারছিটি আপনেরে চাকরীতেরাখবোতো?"

অন্য আরেকজন মাতবরের কথায় তার স্ত্রী মন্তব্য করেছিল যেসব ঘরে আমি এত যাই, ''ওগুলানে কি আমি বিয়া বইছি???" ''ঘর সংসার ফালাইয়া মায়া মানুষ হইয়া দিবরাত্রি এইখানে থাকেন, স্বামী পোলা আছে?" উত্তরে আমার ছেলে ও ননদদের নিয়ে তার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। ননদদের কাছে এক সাথে থাকবার কথা শুনে বিস্মিত। আমার সংসার, আমার রান্না বান্না ঘর কন্যা দেখার তাদের ছিল অদম্য কৌতুহল। এই সময়েই ড্রাগ আসক্ত ছেলেটি-ভাল হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলে উক্ত মাতবর সাহেব তার একটা অসুখের জন্য পরামর্শ চান। ভাগ্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারায় হঠাৎ করেই তিনি পুরুষ মানুষের মত আমারও ''বাইরের কাজ'' করবার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেন। আমার ফিরতে রাত হলে তখন বস্তির কোন ছেলেকে নিয়ে আসতে অনুরোধ করতেন। আমার কাজের প্রয়োজনে ১সপ্তাহ একটা কল–পায়খানাআলা বাড়ীতে ভাড়া থাকতে চাইলে ঐ বাড়ীর পুরুষটির হাত থেকে বাঁচাতে আমাকে নিষেধ করেন সেখানে থাকতে। আমার চাইতে দূর্বল শ্রেণীগত অবস্থানে থেকেও মাঝে মাঝেই পুরুষ হিসাবে, আমার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে আঘাত করতেন, কখনও বা আন্তরিক সদিচ্ছা থেকেই পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমি মধ্যবিত্ত একজন শিক্ষক–গবেষক ঠিকই, তারপরও আমি নারী মাত্র।।

আমার চোখের সামনেই বউ পিটানোর দৃশ্য বা অশ্রাব্য গালিগালাজ এর ঘটনা দেখেও এগিয়ে যেতে পারিনি। কারন সেই বউই আমাকে বলেছে "আপা ভাত–কাপড় দিয়া যদি মারত তয় দুঃখ পাইতাম না। কিন্তু ৮দিনে বাচ্চারে সহ ২০টাকা খোরাকী দিয়া, আরেক বিয়া করতে পারল কেমনে, আমারেই খাওয়াইব কি? ওই শয়তানটারেই বা কি দিব? আইজই যদি মুখে কয় আর ভাত দিমুনা কাইলই একটা ভাল কাজে নাইমা পরমু (মেয়েটি সামান্য মজুরীতে লিপষ্টিকের কারখানায় কাজ করে)। কিন্তু স্বামী না কইলে কেমনে যাই? আপা তুমিতো মেয়ে মানুষ–তুমিই কও, আমি ভালা হইলে একদিন না একদিন ফিরবো না"? আমিও এ সময় মেয়ে মানুষের মতই অসহায় বোধ করেছি। কিংবা অন্য একজন বয়স্কা কারখানা শ্রমিক যখন বললেন, ''আইজ ১০ বৎসর হইল স্বামী ৩য় বিয়া করবার পর থিকা একা থাকি। ছেলেগো বড় করছি, কাজে দিছি। এখনই কথা শুনেনা, বিয়া করলে তো যাইবোই গা। স্বামীর ঘর বাপের ঘর পোলার ঘর কোন ঘরই মোগো জন্যে ঘর না। সারাজীবন কাম করার পর হয়ত শেষ কালেও লাথি–গুতা খামু পোলাগো। তাই অনুরোধ করি তুমি যখন আইছোই, নিজ চোখে সবই

দেখছো, তখন আমাগো একটু লেখাপড়া শিখাও, সরকারী বা ভাল চাকুরী কইরা যেন মেয়েরা খাইতে পারে। অন্তত একটু ভাতের জন্য স্বামীর লাথিগুতা না খাইতে হয় বা হাজারবার বিয়া বইতে না হয়, শেষ জীবনে যেন শান্তি পাই।"

উপসংহার ঃ

উপসংহারে বলব আমার মত আরও অনেক সমাজ গবেষকই এই অনুরোধ ইচ্ছা থাকলেও কিন্তু ওয়ার্ক পর্যায়ে না শোনার ভান করেই চলে আসেন। তবে তার দেওয়া পরামর্শ একটা সমাধানও ইঙ্গিত করে। শহরে এসে এখনও কাজের বিনিময়ে অনেক মহিলাই 'পুরো পেট' খাবার যোগাড় করতে পারেনি, কিন্তু টিকে থাকবার চেষ্টা করছে অবিরাম। মেয়েদের অনেকের জীবনেই "পরিবার/ঘর" এখন আর পুরুষের দ্বারা রক্ষাকৃত এক নিরাপদ স্থান নয়, বরং নিজের তৈরী আশ্রয়স্থল, ও আর্থিক সংস্থানের কেন্দ্র। এটা তাকে ঘরে ও বৃহত্তর সমাজে অধিকতর স্বাধীনতা দিয়েছে কিনা তা এখন নতুন করে জানা ও ভাবার বিষয়।৩ এই দীর্ঘ দিন গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েও বিশেষতঃ নিজ সমাজে, উত্তর দিতেনা পারা বোধকরি কমবেশী সব নৃবিজ্ঞানীরই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয় মাত্র। কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক চলাকালে এবং এখনও এই অনুভূতি আমাকে অন্ততঃ বারবার অনুপ্রাণিত করছে সমস্ত বিষয়টাকে নতুন করে ভাবতে।

সহায়কগ্রন্থঃ

১. স্টীকটার ও পারপার্ট (১৯৯০), *উইমেন, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড দি ফ্যামিলি ইন দি ইনটারন্যাশনাল ডিভিশন অব লেবার*, ম্যাকমিলান, লন্ডন।

২. ইসলাম ও জাইটলিন ১৯৮৭ 'ইথনোগ্রাফিক প্রোফাইল অব ঢাকা বস্তি' পৃঃ ১০৩, *ওরিয়েন্টালজিওগ্রাফার*, ভল্যুম ৩১, ঢাকা।

৩. স্ট্যান্ডিং, এইচ (১৯৯০), *ডিপেনডেন্স এন্ড অটোনমিঃ উইমেনস এমপ্লয়মেন্ট এন্ড দি ফ্যামিলী এই ক্যালকাটা*, রুটলেজ, লন্ডন।